দ্বিতীয় অধ্যায়

'নারী সত্তার সংজ্ঞা নির্মাণে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব'

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘নারী সত্তার সংজ্ঞা নির্মাণে বিভিন্ন নারীবাদী তত্ত্ব’

নারীবাদী চিন্তাধারা মোটামুটি ১৮০০ খ্রিঃ থেকে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করে, তাই ষাটের দশকের পর থেকে ক্রমশঃ নারী সম্বন্ধে বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নারী নিজে যেমন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, অন্যদিকে পুরুষদের ভাবনাতেও আসছে একটা সচেতনতা। তবে ১৮৬৭ খ্রীঃ মিলের ‘Subjection of women’ প্রকাশিত হবার আগে সমাজে নারীর সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি (যদিও ১৭৯২ খ্রীঃ মেরী ওলস্টোন ক্রাফ্টের ‘Vindication of the Rights of women’ গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে)। নারীর স্থান ও প্রয়োজন ছিল কেবলমাত্র সংসার ও সন্তানের জন্ম ও লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামাজিক উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করলেও নারী ছিল প্রধানত এক জৈবসত্তা। কন্যা-জায়া-জননীর বাইরে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি সমাজ। তাই তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত পছন্দ বা ব্যক্তিগত জগৎ কিছুই স্বীকৃত হয় নি। নারীরও যে এই সমস্ত কিছু থাকতে পারে — তা নারী-পুরুষ কেউই ভাবতে পারতো না। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ নারীর আত্ম-আবিষ্কারে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তির চেতনাও বিকাশ লাভ করে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে নারীর অধিকার ও সামাজিক উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ভারতে নারী-শিক্ষার পক্ষে ও নারী-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়; মেয়েরা বাঁচার অধিকার অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, খুব সামান্য সংখ্যায় হলেও, অবরোধ মুক্ত হয়। তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অল্প কিছু নারীর অংশগ্রহণ, তার রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে যে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়, তার ফলে বহু সংখ্যক মেয়েকেবাইরের জগতে পা রাখতে হয়। এর আগে শিক্ষিকা ও সেবিকা ছাড়া, অন্য কোন সামাজিক কাজে তাদের প্রায় দেখাই যায় নি। অবশ্য ‘নিম্নশ্রেণীর’ মেয়েরা চিরদিনই বাইরের কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সাধারণ কেরাণীদের একার আয়ে সংসার চালানো সম্ভব না হওয়ায় তাদের স্ত্রী কন্যারা বাধ্য হয়েছিল ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে পা রাখতে। বিয়ের বাজারেও মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকরী মূল্যবান হয়ে উঠছিল পেতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের শিক্ষালাভের দিগন্ত প্রসারিত হতে শুরু করে।

বাইরের জগতে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা চালাতে গিয়ে একদিকে যেমন তারা নিজেদের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে, অন্যদিকে এই অসম্পূর্ণতার কারণ হিসেবে সামাজিক বঞ্চনাকে চিহ্নিত করতে পারে। কর্মসংস্থানের ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্বের এই ক্রমবিকাশের চিত্র সংগঠিত, অসংগঠিত সমস্ত ক্ষেত্রের কর্মী মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, অন্যদিকে পারিবারিক সামাজিক ক্ষেত্রের বহুমুখী পীড়নের অভিজ্ঞতা তাকে নিজের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

মেয়েরা আরো লক্ষ করে, পরিবারে তাদের একাধারে বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে হয়, অথচ তার কোন মূল্য বা স্বীকৃতি তারা পায় না। স্বামীর উপার্জনের সত্যিকার অংশীদার তারা হয় না। পারিবারিক কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এমনকি সন্তানের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তার থাকে না। এই অধিকারহীনতাকে তারা চিহ্নিত করে এবং পীড়িত হয়। এতদিন পারিবারিক জীবনকে ধর্মীয় অনুশাসনের আড়ালে পবিত্র ও একান্ত ব্যক্তিগতরূপে দেখা হত। এখন মেয়েদের সামনে সেই পবিত্রতার আবরণ খসে যেতে থাকলো। তারা পরিবারের তলিয়ে থাকা শোষণের পটভূমিকেও প্রত্যক্ষ করলো। ফলে যে শান্ত, গৃহকর্ম-নিপুণা, সেবা পরায়ণা নারী আত্মত্যাগের চূড়ান্ত আর্দশ প্রতিষ্ঠা করে সদাহাস্যময়ী মূর্তিতে বিরাজ করতো, তাদের মনেও নানা সংশয় এবং নানা প্রশ্ন দেখা দিল। নিজেদের গুরুত্বহীনতা কে তারা বুঝতে শিখলো। ইতিমধ্যে শিক্ষাগ্রহণ, সামাজিক ভাবের আদানপ্রদান, ও বর্হিবিশ্বের সঙ্গে যোগ তাদের মনে এই প্রত্যয় জাগিয়েছে যে তারা সমস্ত রকম কাজে পুরুষের সমান দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম। বিশেষতঃ যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষমতার ভূমিকা যখন গৌণ হয়ে পড়েছে তখন। এই আত্মশক্তি সমাজে তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণে সচেষ্ট করে তুললো। এই অবস্থায় তারা আর নিজেদের 'other' বা সাপেক্ষ সত্তা হিসেবে মেনে নিতে পারছে না। তৈরী হয়েছে একধরণের আত্মচেতনার সংকট (Identity Crisis), যা তাকে পূর্বনির্ধারিত কন্যা-জায়া-জননীর পরিচিত ভূমিকার বাইরে অন্য এক নিজস্বতার সন্ধানে ব্রতী করেছে। শুরু হয়েছে ব্যক্তি 'আমি'-র অনুসন্ধান। তাই 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণালকে আর মাখন বড়াল লেনের যৌথ পরিবারে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু কোথায় মৃণালের আকাঙ্খিত মুক্তি, সে কথা স্পষ্ট করে লেখক বলতে পারছেন না, কারণ সেই অনুসন্ধান চলছে। তারা বুঝতে চাইছে সমাজে নারীর স্বতন্ত্র ভূমিকা কি। এই চেতনা থেকেই তারা আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমেছে। আজ তারা এক সামাজিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান নারী নিপীড়ন, ধর্ষণ, বধূহত্যা, পণপ্রথার অত্যাচার, ইভটিজিং, কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছনা, বাসে ট্রামে রাস্তায় লাঞ্ছনা ইত্যাদি ঘটনায় নারীর সামাজিক অবস্থা স্পষ্ট। বিবাহ-ই যে নারীজীবনের চরম সার্থকতা — এই ধারণার সামনে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন দেখা

দিয়েছে। অসংখ্য নারী স্বামি-গৃহে লাঞ্ছিত হয়ে মুখ বুজে তা সহ্য করছে কিংবা বাধ্য হয়ে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসছে। ব্যক্তিগত সম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার যে তাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে, তা তারা হৃদয়ঙ্গম করছে। [১]

ইদানীংকালে তাই 'নারী' প্রশ্নটি নিয়ে দুনিয়া জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। নারীর জৈবসত্তা বা সামাজিক সত্তার বাইরে আরো একটি স্বতন্ত্র সত্তার জন্ম হচ্ছে - নারীসত্তা। আধুনিক অর্থে নারী বা নারীসত্তার ধারণাটি জন্ম নিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি চিন্তার জগৎকে যুক্তির উপর দাঁড় করাতে সাহায্য করে এবং জীবিকার প্রয়োজনে মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। ফলে নারীপুরুষের যে চিরাচরিত অসাম্যের ধারণা, তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের দাবী উঠতে থাকে। যারা এই দাবী তোলেন, ব্যাপক অর্থে তাদের বলে 'নারীবাদী'। এই 'নারীবাদ' একটি আধুনিক ধারণা। নারীসত্তার জন্মের পেছনে যে দীর্ঘ বঞ্চনা আর সংগ্রামের ইতিহাস আছে, তা-ই জন্ম দিয়েছে নারীবাদের। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীবাদী দর্শন একটি স্বতন্ত্র রূপ নিতে শুরু করে। এর আগে পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলন দাবীদাওয়া আদায়ের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল, কিন্তু '৭০ এর দশক থেকে তার সঙ্গে যুক্ত হল সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে নারীবাদী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল, সঠিক দিশার অভাবে বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে বেশী মনোযোগী হয়ে তা মাঝপথেই মুখ থুব্‌ড়ে পড়ছিল। ক্রমশঃ তারা উপলব্ধি করছিল যে সমাজের উৎপাদন মূলক কর্মে নিজেকে যুক্ত করতে হলে, সমাজ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে হলে, তাকে নিজের কথা নিজের মত করে বলতে শিখতে হবে, চিনতে হবে নিজের কণ্ঠস্বরকে; আর এরজন্য শুধু ভাষার দক্ষতাই নয়, চিন্তার স্বচ্ছতাও সমান জরুরী। এই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছে নানা নারীবাদী তত্ত্ব।

নারীবাদী তত্ত্ব বা দর্শন শুধুমাত্র নারীদের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করে না। নারীবাদীরা মনে করেন যে, দর্শনের মূল স্রোতে যে অবস্থানটিকে মানুষের প্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে, সেই মানুষ আসলে পুরুষ মানুষ। নারীবাদীরা চান মানুষ বলতে যেন নারীপুরুষ উভয়কে বোঝানো হয়। দর্শনকে এমন প্রেক্ষিতেই বিচার করা হোক্। নারীবাদী দর্শন একাজ দুটি ধাপে সম্পন্ন করতে চায় — (১) বিশেষ লিঙ্গ-বৈষম্য খুঁজে বার করা, (২) লিঙ্গ-সমতা বজায় রেখে দর্শন-চর্চা করলে কেমন হবে, তা দেখানো। সমস্ত নারীবাদীরা এ ব্যাপারে একমত যে নারী-পুরুষের সামাজিক সাম্য আবশ্যক ; কিন্তু কি উপায়ে তা লাভ করা যাবে, এই অসাম্যের কারণ কি, সে ব্যাপারে তাঁরা পোষণ করেন ভিন্ন ভিন্ন মত। এই মতগুলি হল — (১)

উদার নারীবাদ (Liberal feminism), (২) আমূল নারীবাদ (Radical feminism), (৩) মার্কসবাদী দর্শন (৪) মাকর্সবাদী আমূল নারীবাদ (Marxist Radical femenism) ও (৫) উত্তর আধুনিক নারীবাদ।[২]

উদার নারীবাদ (Liberal feminism)ঃ Liberal feminism কে বলা হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীবাদ। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর এরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তা মেরী ওলস্টোনক্রাফ্ট তাঁর 'ভিন্ডিকেশন অফ্ দ্য রাইট্স অফ্ উওম্যান' গ্রন্থে প্রথম এই মত ব্যক্ত করেন, পরে যা আরো গভীর বিকশিত রূপে আসে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'সাবজেকসন অফ উওম্যান' গ্রন্থে। এই মতবাদের লক্ষ্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটানো বা নারী-পুরুষের সমতা প্রদান করা। এরা মনে করেন নারী-পুরুষের লিঙ্গমোচন সম্ভব নয় কিন্তু লিঙ্গ উত্তরণ সম্ভব। এটা কি করে সম্ভব তা বুঝতে হলে Sex Identity ও gender Identity সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা দরকার। Sex Identity হল মানুষের জৈবিক পরিচয়, যা গড়ে ওঠে তিনটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে — (১) ক্রোমোজমের গঠন (২) হরমোন ও (৩) দৈহিক গঠন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পুরুষ আর নারীর গুণগত বৈশিষ্ট্যের তালিকা করলে দেখা যাবে, পুরুষোচিত গুণ ও নারীসুলভ গুণগুলি পরস্পরের বিপরীত। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেই বলেন, নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যের কারণেই এরকম ঘটে।

কিন্তু এব্যাপারে নারীবাদীরা জেন্ডার আইডেন্টিটির কথা বলেন, যা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ দুয়ের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কি না। এ সম্পর্কে একদল বলেন anatomy is destiny, অর্থাৎ এঁরা মনে করেন জৈবসত্তাই নির্ধারণ করে মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও আচরণ। আর কিছু নারীবাদী মনে করেন, জৈব-স্বরূপ যখন অনস্বীকার্য তখন সেই অনুযায়ীই নারী আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। এঁরা মনে করেন সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক। শুধু তাই নয়, এঁদের মতে পুরুষ অপেক্ষা নারী অনেক বেশী মানবিক গুণ সম্পন্ন, তাই এই নারীসুলভ গুণগুলি সমাজে প্রাধান্য পেলে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে বিচার বিশ্লেষণ করলে তা অনেক বেশী মানবিক হবে। এই নারীকেন্দ্রিক মতটিকে বলা হয় -- 'সেন্ট্রিসিজ্ম'।

কিন্তু লিবারাল ফেমিনিষ্টরা মনে করেন পুরুষ যেমন সমাজে তার ইচ্ছেমত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, নারীকেও দিতে হবে তার অধিকার। এবং এর জন্য তাদের সাহায্য করবে বিভিন্ন আইন-কানুন। রাষ্ট্রকে সেই অনুযায়ী বিধিবিধান প্রণয়ন করে নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে, মেয়েদেরকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে। 'এম্পাওয়ারমেন্ট' এর উপরএঁরা খুব জোর দেন। এঁরা মনে করেন, দেশের আইন কানুন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তাই ন্যায়-নীতির

কোন 'সেক্স আইডেন্টিটি' নেই, 'জেন্ডার আইডেনটিটি' নেই। এরা এটা মনে করেন না যে, জন্মসূত্রে স্থির হয়ে যায় সারা জীবন ধরে সে কেমন আচরণ করবে। কোন্ সমাজে নারীর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিততা মানুষের সেক্স নির্ধারণ করে না, কারণ আমাদের জৈবিক পরিচয় ক্রোমোজম বা হরমোনের দ্বারা নির্ধারিত হলেও তার লিঙ্গ-পরিচয় সমাজ সৃষ্ট। কিন্তু মানুষের মন যেহেতু চলে যুক্তির নিয়মে এবং সেই যুক্তির দ্বারাই রচনা করে আইন-কানুন, দর্শন, এক কথায় কালচার, তাই এসব ক্ষেত্রে সেক্স আইডেনটিটি বা জেন্ডার আইডেনটিটি কোন ছায়াপাত করে না। এঁরা মনে করেন যুক্তির কোন লিঙ্গ পরিচয় নেই। যখন মানুষ যুক্তির দ্বারা চালিত হয় তখন তারা নারী পুরুষ এই পরিচয়ের অতিরিক্ত মানুষ পরিচয়ে উন্নীত হয়। এই মানুষ পরিচয়টি আমাদের যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয়কে অতিক্রম করে যায়। এভাবেই তারা চান একটি ইতিহাস-নিরপেক্ষ তত্ত্বের কোটি নির্মাণ করতে, যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তিই হবে একমাত্র চালিকা শক্তি।

এঁরা নারীর কোন বিশেষ সমস্যার বিশ্লেষণের জন্য যে কোন তত্ত্বকে কাজে লাগাতে চান — মার্কস বা ফ্রয়েড যে কাউকেহ এঁরা বেছে নিতে পারেন। একে বলা হয় অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প (method of inclusion)। সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রেও এঁরা অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন, যেমন মেয়েদের মূল সামাজিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তাদের পুরুষদের সমান শিক্ষার অধিকার দিতে হবে, কাজের অধিকার দিতে হবে। এই সমস্ত দাবী নিয়ে লিবারাল নারীবাদীরা ১৯৬৬ সালে গঠন করেন NOW (National Organization for Woman)। এখানে তারা আটদফা দাবী পেশ করেন —

(১) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সমান অধিকার প্রদান।

(২) নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য আইন করে নিষিদ্ধ করা।

(৩) কর্মক্ষেত্রে মেটারনিটি লিভ ও সোশ্যাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) কর্মরত অভিভাবকদের শিশু ও পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়করে ছাড় দেওয়া।

(৫) শিশুদের দেখাশোনার জন্য ক্রেশ নির্মাণ।

(৬) সমান শিক্ষা ও একই প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের অধিকার।

(৭) কর্মক্ষেত্রে সমান প্রশিক্ষণের অধিকার এবং দরিদ্র মহিলাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা।

(৮) মহিলাদের নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার।

এইভাবে আইন প্রণয়নের দ্বারা এঁরা মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে চান। সমাজ পরিবর্তনের কথা এঁরা বলেন না। এঁরা বলেন, সমাজে যে ব্যবস্থাই চালু থাকুন না কেন, মেয়েরা যেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। শুধু সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির কথাই এঁরা বলেন না, ব্যক্তি জীবনে মেয়েদের

যে বঞ্চনা তা নিয়েও এঁরা সোচ্চাব, যেমন- মেয়েরা যে ঘরের কাজ করে তাকে শ্রমের মর্যাদা না দেওয়া, বিজ্ঞাপনে নারী-শরীর ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে কঠোর আইন চান এঁরা । এঁরাও মনে করেন 'the personal is political' । এঁদের আন্দোলনের ফলেই অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আচরণ আজ আইনের দৃষ্টিতে বিচার্য।

পুরুষ যেমন যে কোন ভূমিকায় নিজেকে পরখ করে দেখতে পারে, নারীকেও দিতে হবে সেই অধিকার। সমাজ বা রাষ্ট্র নয় সে নিজে তার ভূমিকা স্থির করার অধিকারী হবে। নারী স্বার্থ বিরোধী সমস্ত আইন শুধু বাতিল করলেই হবে না সঙ্গে সঙ্গে এমন আইন করতে হবে যা নারীর স্বার্থ বক্ষা করে। বিভিন্ন পেশায় নারী-কর্মী নিয়োগ না করার যে রীতি আছে তা নাকচ করতে হবে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বাদ দিয়ে শুধু নারীই নিয়োগ করতে হবে, কারণ এতদিন তাদের বঞ্চিত করার ফলে যে পশ্চাদ্‌পদতা তৈরী হয়েছে, তা এভাবে দূর করা সম্ভব। তারা মনে করেন নারীমুক্তি কেবল নারীর মুক্তি ঘটাবে না, ঘটাবে পুরুষেরও মুক্তি।[৩]

নারীমুক্তির মার্কসবাদী তত্ত্ব

নারীমুক্তি সম্পর্কে মার্কসবাদে যে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে, তা মূলতঃ পাওয়া যায় এই গ্রন্থগুলিতে —

(১) পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি — এঙ্গেলস,

(২) কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো।

এছাড়া লেনিন, স্তালিন, বেবেল, রোজা লুক্সেমবার্গ, ক্লারা জেট কিন, ক্রুপস্কায়া, আলেকজান্দ্রা কোলন্তাই প্রমুখের লেখা ও প্রদত্ত ভাষণ থেকেও নারীমুক্তির একটি সমাজতাত্ত্বিক বস্তুবাদী রূপরেখা পাওয়া সম্ভব।

এঙ্গেলস্-এর গ্রন্থে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীর দাসত্ব ও অমর্যাদার সামাজিক - ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে এঙ্গেল্‌স দেখিয়েছেন যে পিতৃতন্ত্র হল ইতিহাসগত বিকাশের ফল, নারীর চেয়ে পুরুষের প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ নয়।

মার্কস ও এঙ্গেল্‌স কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থা পর্যালোচনা করে, নারীর সামাজিক মর্যাদার একটা বিজ্ঞানসম্মত

ব্যাখ্যা ও তার মুক্তির সম্ভাব্য পথকে দেখিয়েছেন। তাঁরা মনে করেছেন-সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলি প্রধানতঃ নারীর প্রতি বৈষম্যের জন্য দায়ী। যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদনের হাতিয়ার ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নারী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি সাধারণ যন্ত্র হয়েই থাকবে।

১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিতে 'নব্য নারী-আন্দোলন' শুরু হয়। এই আন্দোলনের তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিক নীতিগুলি স্থির হয়েছিল নারীর সামাজিক চাহিদা এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যেকার বৈষম্যের প্রভাবে। এই নীতিগুলির মধ্যে এমন কিছু ইতিবাচক দিক আছে যা নারীদের আকর্ষণ করে। এছাড়া মেয়েদের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য ও সমাজের অন্যায্য রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার জন্য এই আন্দোলন অনেকের মনে সাড়া জাগায়। এটা একটা মহান লক্ষ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু মার্কসবাদীরা মনে করেন, এদের আন্দোলন ততদিন পর্যন্ত একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনই থাকবে যতদিন তারা পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম ও পুঁজি এবং শোষিত ও শোষকের মধ্যেকার মৌলিক বিরোধকে উপেক্ষা করবেন। কারণ নারী পুরুষের সমানাধিকার তখনই সম্ভব যখন শোষণের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিলুপ্ত হবে এবং নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক সমানাধিকার অর্জিত হবে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের সত্যকার সমানাধিকার লাভ তখনই সম্ভব যখন উৎপাদনের উপায়গুলির উপর সর্বসাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শ্রমের ফল সর্বজনীন সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। উৎপাদনের হাতিয়ার হয়ে থাকার অবস্থা থেকে মেয়েদের মুক্তি ঘটবে।

কিন্তু এটাকী ভাবে ঘটবে সে সম্পর্কে ইস্তেহারে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি, তবে সেখানে বলা হয়েছে — 'অনুপূরক এই ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোপও অবশ্যম্ভাবী, পুঁজি উচ্ছেদের সঙ্গেই আসবে উভয়ের অর্ন্তধান' এবং 'পারিবারিক শিক্ষার জায়গায় বসানো হবে সামাজিক শিক্ষা'। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ ব্যবধান আসলে লোপ পাবে ও পুরুষ নারী মজুরী শ্রম থেকে, শ্রমের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে একসাথেই।

কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে এই অভিযোগটি প্রায়ই শোনা যায় যে তারা পরিবার প্রথার উচ্ছেদ চান। আসলে কমিউনিষ্টরা মনে করেন, যা এঙ্গেলস্ তাঁর পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি গ্রন্থে দেখিয়েছেন, যে এক পতি-পত্নী পরিবার প্রথা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-অধিকার এর জায়গা দখল করলো পিতৃ-অধিকার (যাকে তিনি নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয় বলেছেন) এবং নারীর অবস্থানেরও

ঘটেছে বিরাট পরিবর্তন —

'পুরানো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের ছেলেমেয়েরা থাকতো, সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা স্ত্রী-লোকের উপর ন্যস্ত ছিল — এ কাজটি পুরুষের খাদ্য আহরণের মতই একটি সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হত। পিতৃপ্রধান পরিবার আসার সঙ্গে অবস্থা বদলে গেল এবং আরও বেশী বদলালো এক পতি-পত্নী স্বতন্ত্র পরিবার আসার ফলে। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য চলে গেল। এটি আর সমাজের দেখবার বিষয় রইল না, এটি হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত সেবা। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ত্রী-ই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি।' তাই তিনি মনে করেছেন, 'সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রী জাতিকে নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত, এবং এর জন্যই আবার দরকার হচ্ছে সমাজের অর্থনীতির একক হিসেবে ব্যক্তিগত পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপ।'[৪]

নারীবাদীরা একথা স্বীকার করেন যে পরিবারে নারীদের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়; কন্যা, স্ত্রী বা জননী যে কোন ভূমিকাতেই তারা বিভিন্ন ভাবে শোষিত বা পীড়িত হয়। এর সমাধানকল্পে তারা পরিবার ও বিবাহপ্রথার নানারকম সংস্কার সাধনে প্রয়াসী। এবং এই সংস্কার সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সম্ভব বলে তারা মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় একথা কেবল অসাধারণ মহিলাদের জন্যই আংশিকভাবে সত্য হতে পারে, কারণ বর্তমান বিবাহ-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপাদানটিকে উপেক্ষা করা যায় না। এই নারীবাদীরা বিবাহ এবং পরিবারের আধুনিক রূপের পেছনে ক্রিয়াশীল শর্তগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেন না, যা ছাড়া সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। পরিবার-সমস্যা জীবনের মতই জটিল ও বহুমুখী। এঙ্গেলস্ বলেছেন — 'উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালি পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে। শিশুর শিক্ষা ও পরিচর্যা হয়ে উঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহ-বন্ধনের মারফত বা তার বাইরে, শিশু যেভাবেই জন্মাক না কেন, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে।'[৫]

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় নারীমুক্তির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আলেকজান্দ্রা কলন্তাই। তিনি নারীর গার্হস্থ্যশ্রম ও মাতৃত্বকে এবং যৌন সম্পর্ক থেকে মাতৃত্বকে পৃথক করে দেখেন। তিনি বলেছেন, গৃহকর্মের সামাজিকীকরণই কেবল ঘটবে না, তা শুধু নারীর কাজও আর থাকবে না। নারী পুরুষ উভয়ে মিলে সামাজিক শ্রম হিসেবে গৃহকর্ম করবে। মাতৃত্ব, সন্তান পালন আর ব্যক্তিগত বিষয় থাকবে না, হয়ে উঠবে সামাজিক বিষয়। সন্তানের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। ১৯১৯ সালে এক বক্তৃতায় লেনিন বলেন —

'গৃহস্থালি কাজের কারণে, মেয়েরা এখনো খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। তার সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য,

তাকে পুরুষের সমান করার জন্য জাতীয় অর্থনীতির সমাজতন্ত্রীকরণ করতে হবে, আর মেয়েদের সাধারণ উৎপাদনে অংশ নিতে হবে। মেয়েদের পূর্ণ অধিকার দিলেও তারা নীচু অবস্থায় থেকে যায়, কারণ গৃহস্থালি কাজের পুরো দায়িত্ব থেকে যায় তাদের উপর। আমরা বিভিন্ন মডেল সংস্থা, খাবার ঘর, নার্সারি তৈরী করছি মেয়েদের গৃহকর্ম থেকে মুক্ত করার জন্য।'[৬]

কলন্তাই বলেছেন যে, রাশিয়ায় কার্যত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ রাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্বক ধ্বংসসাধন নয়, পরিবারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে। পরিবার শ্রমিককে আরো কার্যকরী ও উৎপাদনশীল হওয়া থেকে বিরত করে, পরিবারের সদস্যরাও আর পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, কারণ সন্তান লালন পালনের যে দায়িত্ব এতদিন তাদের উপর ছিল, তা আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব; সাহায্যহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে মেয়েদেরকে আর চিন্তা করতে হয় না। কমিউনিষ্ট সমাজে নারীকে তার স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় না, বরং নির্ভর করতে হয় তার কাজের উপর । বিবাহ হবে দুজন নরনারীর সৎ ও মুক্ত মিলন, যার ভিত্তি হবে শুধু প্রেম। অর্থনৈতিক বিবাহ লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে বেশ্যাবৃত্তি, যার শিকড় আছে পণ্য উৎপাদন ও ব্যক্তি-মালিকানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। একবার এই সমস্ত অর্থনৈতিক রূপগুলোকে অতিক্রম করে গেলে নারীদের পণ্য করা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং পরিবারের বিলোপ হলে চিন্তার কিছু নেই, বরং যে নতুন সমাজ নারীকে পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে, মাতৃত্বের বোঝা কমিয়ে আনবে এবং সর্বোপরি বেশ্যাবৃত্তির জঘন্য অভিশাপের ইতি টানবে, তাকে সাদরে বরণ করা উচিত।[৭]

উত্তর-আধুনিক নারীবাদ

উত্তর আধুনিকতা হল আধুনিক পরবর্তীকালের দর্শন। অন্যান্য দর্শনের মত এই দর্শনেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীবন-জগৎ-ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে। এই দর্শন তিন বা চারের দশক থেকেই নানা ক্ষেত্রে মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। সমসাময়িক কালের বেশ কয়েকটি ঘটনা উত্তর আধুনিক দর্শনের অভিমুখ গড়ে তোলে; তার মধ্যে অন্যতম আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা জুড়ে উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীবাদের উত্থান, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের পতন ইত্যাদি। উত্তর আধুনিক দর্শনের প্রধান তিন ব্যক্তিত্ব — ফুকো, লাকাঁ ও দেরিদা। ফুকো সমাজ, ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভূমিকা এবং চাপের সর্বগ্রাসী অবয়ব বিশ্লেষণ করে দেখান। লাকাঁ মানবমনকে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পাঠ করতে চান আর দেরিদা ভাষা ও দর্শনের ক্ষেত্রে 'অদ্বিতীয়, সমগ্র, বদ্ধ' শব্দ-তালিকার বদলে বহু বিকল্প - সমৃদ্ধ

তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। দেরিদার বির্নিমাণ পদ্ধতি এই চিন্তাধারার খুব বড় হাতিয়ার।

তবে উত্তর আধুনিক তত্ত্ব বুঝতে গেলে আধুনিক তত্ত্ব সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ১৬০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত সময় প্রচলিত যাবতীয় তত্ত্বকে আধুনিক তত্ত্ব বলা যেতে পারে। তবে পারিভাষিক অর্থে মডার্নিজম বলতে একটি কালের যাবতীয় তাত্ত্বিক ফসলকে বোঝায় না, বোঝায় বিশেষ তত্ত্বের বিশেষ তত্ত্ব-কাঠামোকে।

আধুনিক তত্ত্ব-কাঠামোর প্রথম স্বীকার্য হল, মানুষের চিন্তন কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করে চলে। একে বলে চিন্তনের বিধি বা Laws of thought । অ্যারিষ্টটল তিনটি মৌলিক বিধির কথা বলেছেন — (১) বিরুদ্ধতা বিধি (Law of Contradiction), (২) নির্মাধ্যম বিধি (Law of excluded middle) ও (৩) তাদাত্ম বিধি (Law of Identity) ।

বিরুদ্ধতা বিধির সাংকেতিক রূপ হল (ক ~ ক) । এর অর্থ, কোন বচনে 'ঐ ব্যক্তি ভাল এবং ভাল নয়' - এই ধরণের কথা বলা যাবে না। বচনটির মধ্যে বিরুদ্ধতা আছে।

নির্মাধ্যম বিধি ঃ এর সাংকেতিক রূপ (ক ∨ ~ ক) ' ক ' অথবা ' ক - নয় ' এর বিকল্প ভাবা যায় না। জগতে যা কিছু আছে তা হয় 'ক', নইলে 'ক নয়' কোটির সদস্য। এই দুই কোটির বাইরে কোন কোটি নেই । এই বিধিটিতে জগতের সমস্ত কিছু স্পষ্ট দুটি কোটিতে ভাগ করা হয়েছে। যদি কোন মত সত্যি না হয় তবে তা অবশ্যই মিথ্যে হবে। এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন অবস্থা থাকতে পারে না।

চিন্তনের তৃতীয় কোটিটি হল **তাদাত্ম বিধি** (ক ⊃ ক)। এর অর্থ একজন ব্যক্তি কেবল নিজের সঙ্গে তাদাত্ম্যক হতে পারে, অন্য কারো সঙ্গে নয়। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা নির্মাধ্যম বিধিটিকে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে করেন। কারণ এভাবে যে দুটি স্পষ্ট কোটি তৈরী করা হয়েছে, তার একটিকে উৎকৃষ্ট ও অন্যটিকে নিকৃষ্ট ভাবা হয়। এক কোটিতে সাদা থাকলে অন্য কোটিতে অবস্থান করে কালো, আলোর বিপরীতে থাকে অন্ধকার, পুরুষের বিপরীতে নারী। এই চিন্তা কাঠামোয় জগৎকে দেখার ফলে মানুষকেও স্পষ্ট দুটি বর্গে বিভক্ত করার প্রবণতা দেখা দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার হয় বিভিন্ন বর্গ, কোথাও তারা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, কোথাও শূদ্র, দরিদ্র, বিভিন্ন অনগ্রসর জনজাতি বা নারী।

উত্তর আধুনিকরা প্রচলিত এই চিন্তা কাঠামোকে ভাঙতে চাইছেন। তাঁরা চিন্তনের এই বিধিকে বলছেন Patriarchal binary thought. এই চিন্তা প্রক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট স্পষ্ট দুটি বর্গে সমস্ত কিছুকে ফেলা হয়, উৎকৃষ্ট বর্গে না পড়লে তাকে নিকৃষ্টই হতে হবে। এই নিকৃষ্ট বর্গের অন্যতম বাসিন্দা হল নারী।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা মনে করছেন, এই আধুনিক চিন্তা অভ্যাসের ফলে যে বৈষম্যগুলি তৈরী হয়েছে তার মধ্যে লিঙ্গ-বৈষম্যই হচ্ছে প্রধান এবং দৃঢ়মূল, তাই তা সহজে দূর হবার নয়। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পাল্টে গেলেও চিন্তাকাঠামোর পরিবর্তন না হওয়ার ফলে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়না। বিভেদ ও বৈষম্যভাবনা হাত ধরাধরি করে চলে, ফলে এক জায়গায় বৈষম্য ভাবনা দূর হলে অন্যরূপে অন্য জায়গায় তা হাজির হয় — সতীদাহ বন্ধ হয়, বধূ হত্যা শুরু হয় .....।

জগতের সব পারস্পরিক সম্পর্ক, আধুনিকদের মতে, হয় চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক নতুবা উচ্চ-নীচ স্তর বিন্যাসের সম্পর্ক। এর ফলে ক্ষমতার তারতম্য বজায় রাখতে সুবিধে হয়। তবে উত্তর আধুনিকরা মনে করেন যে শুধুমাত্র আধুনিক তত্ত্ব ও তার অপপ্রয়োগই নারী অবদমনের একমাত্র কারণ নয় — এর প্রধান কারণ ক্ষমতার অসম বন্টন। আধুনিক চিন্তাকাঠামোয় নির্মাধ্যম বিধিতে জগৎকে যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট বর্গে বিভক্ত করা হয়, সেখানে কে উৎকৃষ্ট এবং কে নিকৃষ্ট তা নির্দিষ্ট হয় 'রাজনীতির' দ্বারা। রাজনীতি শব্দটি এরা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা একজন বা একদল, আরেকজন বা আরেকদলের উপর আধিপত্য বজায় রাখে, তা-ই রাজনীতি।

উত্তর-আধুনিকরা মনে করেন আধুনিকরা যত সহজে সঠিক-বেঠিক, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বিচার করে ফেলেন, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। এর দ্বারা শুধু যে মতের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা হয় তাই নয়, বৈষম্যও সৃষ্টি করা হয়। বলা হচ্ছে, জগতে পুরুষ ও নারী দুটি বর্গ আছে। এরা স্বভাবে পৃথক। পুরুষোচিত গুণাবলীকে উৎকৃষ্টতা দিয়ে নারীসুলভ গুণগুলিকে নিকৃষ্ট করা হয়। উত্তর আধুনিক নারীবাদীরা মনে করেন, জগতে সৎবস্তুর 'প্রকৃত প্রকার' (Natural Kind) নেই। এই উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-নারীসুলভ ইত্যাদি ধারণা সমাজের তৈরী করে নেওয়া শুধু নয়, আপেক্ষিকও। এঁরা নারী এবং পুরুষ উভয়ের মধ্যেই উভধর্মিতা আবিষ্কার করেছেন। তারা নারী-পুরুষের বিশিষ্টতার কথা বলেছেন, কিন্তু তাদের স্বরূপ নির্দিষ্ট করতে চান নি। কারণ তারা সিদ্ধান্ত সব সময় 'ডেফার' (মুলতুবি) রাখতে চান। একাধিক ব্যাখ্যা যখন একই সঙ্গে মনোযোগ দাবী করে তখন তাদের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে, তবু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় সমস্যাটির নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা বিচার করতে হয়। কিন্তু উত্তরাধুনিকদের মতে, এভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করা ও মতের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা হয়, যা পুরুষতন্ত্রের সুচিন্তিত কর্মসূচী। তাই, তাদের মতে, প্রচলিত ভাবধারায় পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যকে মহান ও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এমন কি নারী-পুরুষ নিরপেক্ষভাবে যখন সাধারণ মানবিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়, তখন ও লক্ষ্য করা যায় যে সেগুলি পুরুষের বৈশিষ্ট্যের যত কাছাকাছি, নারীর বৈশিষ্ট্যের ততখানি নয়। ফলে পুরুষ আদর্শ মানুষের গুণ আয়ত্ত করে হয় প্রভু, আর নারী হয় তার আশ্রিত। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা

মনে করেন, এই প্রক্রিয়ায় চিন্তার ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে এক কৃত্রিম রেষারেষির সৃষ্টি হয়। নারীরা পুরুষের মত হবার চেষ্টা করে, তাকেই আদর্শ ভাবে।

এদের মতে বস্তুর সাধারণ ধর্ম বলে কিছু নেই, সবই সমাজসৃষ্ট। তাই নির্দ্বিধায় এটা পুরুষের ধর্ম, এটা নারীর ধর্ম, এভাবে কিছু বলা যায় না। এরা নারী-পুরুষের বিশিষ্টতার কথা বলেন কিন্তু তাদের স্বরূপ নির্দিষ্ট করতে চান না। কারণ দুটি বস্তু বা বিষয়কে স্পষ্ট দুটি কোটিতে স্থাপন করার অর্থ হল, তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু বাস্তবে নারী/পুরুষ, মানুষ/প্রকৃতি বা দিন/রাত্রি এরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়, এদের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি পরস্পর নির্ভরশীলতাও আছে। তাই এভাবে একটিকে উৎকৃষ্ট, অন্যটিকে নিকৃষ্ট বা একটিকে কেন্দ্রে, অন্যটিকে প্রান্তে ভাবার যে মানসিকতা, তার পরিবর্তন চান এরা।

তবে এই মানসিকতা বা চিন্তা প্রক্রিয়াকে ভাঙতে হলে, প্রচলিত ভাষা কাঠামোয় থেকে তা করা যাবেনা, ভাষার মধ্যেও আনতে হবে পরিবর্তন । এককথায় তারা ভাষার বিনির্মাণ চান। ফরাসী উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা বিশেষ ভাবে ভাষার বিনির্মাণের কথা বলেন। এলেন সিজো, ল্যুস ইরিগারে, জুলিয়া ক্রিস্তেভা প্রমুখরা এ বিষয়ে অনেক কাজও করছেন। এরাও দেরিদার মত পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের নিরন্তর বাক্‌কেন্দ্রিকতা (Logocentrism) -কে ধ্বংস করতে চান। নারীমুক্তির প্রকৃত অর্থ এদের কাছে প্রচলিত চিন্তা-প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি। সমাজে নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে সৃজিত হবার ফলেও লিঙ্গ-বৈষম্যের সৃষ্টি হয় বলে এরা মনে করেন। এছাড়া সংস্কৃতি (Culture) রক্ষার দায়িত্ব পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিয়ে জীব পালিনীর দায়িত্ব নারীর উপর রাখার মধ্যেও আছে বৈষম্য টিকিয়ে রাখার বীজ।

উদার নারীবাদীদের 'এম্পাওয়ার্ড' হওয়ার বা ক্ষমতায় ঢুকে পড়ার নীতিতে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব বলে এরা মনে করেন না, কারণ ক্ষমতায় গেলে সেও প্রচলিত ক্ষমতার একজন ধারক ও বাহক হয়ে যাবে । এতে সমাজের উপর তলার কিছু মেয়ের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন এলেও সমাজে সামগ্রিকভাবে কোন পরিবর্তন আসবে না। তাঁরা চান পুরো তন্ত্রটাকেই পাল্টে ফেলতে এবং এ ব্যাপারে নারী-অবদমনের দার্শনিক পটভূমির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তারা মনে করেন, এই কারণেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও নারীমুক্তি ঘটে না। তাই প্রথমেই এরা ধারণার স্তরে বিপ্লব ঘটাতে চান। সেজন্য তাঁরা এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামো চান যেখানে বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা বজায় থাকে। যুক্তি দিয়ে সব কিছুকে বিচার করা যায় না। যেমন একান্ত নিজস্ব কিছু অনুভূতি আছে যা একজন নারীর-ই থাকতে পারে, যা যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা নাও করা যেতে পারে। পুরুষতন্ত্রের প্রবণতা, চিন্তাকে একরৈখিক করা, যা অবশ্যম্ভাবীভাবে পুরুষতন্ত্রের ইচ্ছানুসারী হয়। এইভাবে মূলতঃ আমাদের চিন্তা-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে নারীমুক্তির পথ তৈরী করতে চান উত্তর আধুনিক নারীবাদীরা।[৮]

আমূল নারীবাদ (Radical Feminism) ঃ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে, অন্তর্ভূক্তির প্রকল্পের দ্বারা — কিছু আইন প্রণয়ন করে — নারীর অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব বলে এঁরা মনে করেন না। এঁরা নারীপীড়নের সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেন লিঙ্গ-পীড়ন দিয়ে। আর সবরকম লিঙ্গ-পীড়নের মূলে আছে পিতৃতন্ত্র। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে এই বৈষম্য দূর হবে না। লিবারালরা যে আইনের দ্বারা সুবিচার প্রত্যাশা করেন, সেই আইন পিতৃতন্ত্রের সৃষ্ট, সুতরাং পক্ষপাত দুষ্ট ; কারণ মানুষের কোন লিঙ্গ নিরপেক্ষ, ইতিহাস নিরপেক্ষ অবস্থান থাকতেই পারে না।

এঁরা দাবী করেন আত্ম নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ অধিকার ও যৌন স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা ঘটতে পারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধনের মধ্যে দিয়ে। এই প্রযুক্তি ধ্বংস ঘটাবে জৈবিক ভূমিকার। নারী তার শরীর ও জরায়ুর উপর লাভ করবে নিরঙ্কুশ অধিকার, কৃত্রিম উপায়ে সন্তান ধারণ সম্ভব হবে, ফলে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শের মৃত্যু ঘটবে। এই ধারার নারীবাদীদের প্রধান দাবীগুলি ছিল —

(১) সমবেতন,

(২) সমান শিক্ষা ও কাজের সুযোগ,

(৩) আর্থিক ও আইনি স্বাধীনতা,

(৪) চব্বিশ ঘন্টার অবৈতনিক নার্শারি,

(৫) বিনামূল্যে গর্ভ নিয়ন্ত্রক ও গর্ভপাত,

(৬) নারীর নিজস্ব যৌনতা নির্ধারণের অধিকার,

(৭) লেসবিয়ান সম্পর্কে বৈষম্যের অবসান,

(৮) যৌন পীড়ন ও ভায়োলেন্স থেকে মুক্তি।

এরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন নারী নিপীড়নকারী সেই সমস্ত উপায়গুলির দিকে যেগুলি উদ্ভুত হয়েছিল পাশ্চাত্য সমাজের বিশেষ গঠনের জন্য। সিমন দ্য বোভোয়ার তাঁর 'second sex' - গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে পশ্চিমী সংস্কৃতি পুরুষকে স্বাভাবিক এবং নারীকে বিচ্যুতি বা অপর (other) হিসেবে দেখেছে। তিনি নারীর বিশেষ প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। (কেট মিলেট তাঁর 'sexual politics' গ্রন্থে রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এই ভাবে) — যে পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বা সরকার রক্ষা করা হয় তাই রাজনীতি। রাজনীতির অন্তর্বস্তু হচ্ছে ক্ষমতা। আরেকটু বিস্তৃত করে বললে এভাবে বলা যায় — (কোন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেসব কৌশল গ্রহণ করা হয়, তাই রাজনীতি। এই নিয়ন্ত্রনের প্রকরণগুলির দ্বারা পিতৃতন্ত্র নামক প্রতিষ্ঠানটি চালু থাকে। যে পদ্ধতিতে শাসক লিঙ্গ পরাধীন লিঙ্গের উপর তার ক্ষমতা রক্ষা করতে ও প্রসারিত করতে চায়, তাই রাজনীতি।) তিনি আরো বলেছেন যে, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার

করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে এবং অতীতেও যৌন সম্পর্কই হচ্ছে এমন একটা সম্পর্ক যা আধিপত্য এবং বশ্যতার সম্পর্ক। আমাদের সমাজে যে ব্যাপারটার পর্যালোচনা হয় না এমন কি যার স্বীকৃতিও নেই তা হল জন্ম অধিকারগত গুরুত্ব; যার দ্বারা পুরুষ নারীকে শাসন করে। এই ব্যবস্থার দ্বারা সুচারু রূপে আভ্যন্তর আধিপত্য লাভ সম্ভব হয়। যৌন সম্পর্কের এই ব্যবস্থা নিটোল, স্থায়ী ও শক্তিশালী। এর উপস্থিতি যতই নীরব হোক্ না কেন, যৌনতার ক্ষেত্রটি আমাদের সংস্কৃতির সর্বাধিক গভীর ও প্রভাব বিস্তারকারী মতাদর্শ এবং ক্ষমতার সবচেয়ে মৌলিক ধারণা হিসেবে রয়েছে।

যেহেতু রাজনীতির মর্মবস্তু হচ্ছে ক্ষমতা আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতার সমস্ত এলাকাতে পুরুষের আধিপত্য বর্তমান তাই তার প্রভাব সমাজে পড়তে বাধ্য। তাই অতিপ্রাকৃত কতৃত্ব এবং তার সঙ্গে যুক্ত নীতিমালা ও মূল্যবোধ যা প্রভাবিত করছে আমাদের দর্শন কলা তথা সমগ্র সংস্কৃতিকে; তার সবগুলোই পুরুষের হাতে গড়া। অর্থাৎ আমাদের সমাজের গঠনটাই (যুগ যুগ ধরে) এমন যার মধ্যে খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। সে জন্য সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানা উপকরণ।

আমূল নারীবাদীরা লিঙ্গসাম্য আনতে চান। এই সাম্য সবার আগে আনতে হবে আমাদের চিন্তাজগতে; এত দিনের যে চিন্তন প্রক্রিয়া, সেখানেই পরিবর্তন আনতে হবে, বৈষম্যের মূল কারণ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করতে হবে যে স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার আস্ফালন এই বৈষম্যের জন্য দায়ী তাকে দূর করতে হবে। যদিও এরা মনে করেন না যে anatomy is destiny, এঁদের মতে আমাদের যৌন পরিচয় যেমন আমাদের লিঙ্গ পরিচয়কে প্রভাবিত করে, তেমনি আমাদের লিঙ্গ পরিচয় আমাদের যৌন পরিচয়ে বিবর্তন ঘটায়, অর্থাৎ nature এবং gender এর মধ্যে একটা উভমুখী সম্বন্ধ আছে। কিন্তু লিঙ্গ-বৈষম্যের বীজ এরা খুঁজে পেয়েছেন যৌন-সম্পর্কের মধ্যে।

এঁরা নারীকে সন্তান ধারণ ও লালন পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে চান। মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একা নারীর নয়। এই দায়িত্ব পালন করতে হবে পুরুষকেও। এই মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীকে দিতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও যৌন-স্বাধীনতা, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নূতন নূতন উৎভাবনা শুধু নারীকে গর্ভধারণের দায় থেকে মুক্তি দেবে না, ধ্বংস করে দেবে পরিবারের জৈবিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শক্তির সম্পর্ক। জৈবিক পরিবার বিলুপ্ত হলে যৌন-পীড়নও লোপ পাবে, তখন যৌন সম্পর্ক স্থির করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রতিটি নরনারীর। ফলে সমকাম, বিসমকাম প্রভৃতি ধারণাই লোপ পাবে। লোপ পাবে 'যৌনসংগম' নামক সংস্থাটি, যেখানে নারীপুরুষ পালন করে সু-নির্দিষ্ট ভূমিকা। এই বিপ্লব শুধু নারীকে মুক্ত করবে না, মুক্ত করবে পুরুষকেও।

আমূল নারীবাদীদের আরেকটি ধারা হচ্ছে, নারী-সমকামী স্বাতন্ত্র্যবাদ। পুরুষাধিপত্য বিলুপ্ত করতে এরা পুরুষ বর্জন করে নারীকে যৌনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে চান, অনেকে পিতৃতন্ত্রের বদলে চান মাতৃতন্ত্র।

এঁদের মতে পরিবার একটি জৈব সংগঠন। জৈব প্রয়োজনেই উৎপত্তি ঘটেছে পরিবারের। গর্ভধারণ করতে গিয়েই নারীকে মেনে নিতে হয়েছে পুরুষের অধীনতা। ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে আদি ও মৌলিক পীড়ন হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক শারীরিকভাবে নারীকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসা। জৈব পরিবারে যে শক্তির সম্পর্ক দেখা দেয় তা-ই শক্তির মৌল কাঠামো। নারীমুক্তির জন্য তাই এরা চান প্রযুক্তি-বিপ্লব যা নারীর নির্দিষ্ট জৈব ভূমিকাকে বাতিল করে দেবে। মানব প্রজাতি কে টিকিয়ে রাখতে নারীদের-ই কেবল মাত্র গর্ভধারণ ও শিশু পালনের দায়িত্ব গ্রহন করতে হবেনা, কারণ মাতৃত্ব নারীকে ক্ষমতাচ্যুত করা বা দায়িত্বচ্যুত করার অন্যতম কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এঁরা লিবারালদের মত ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা রূপে দেখতে চান না। এরা মনে করেন, প্রতিটি ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং এই পারস্পরিকতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। এরা মনে করেন, একটি সত্তা যদি তার ব্যক্তি-স্বরূপের জন্য অন্য একটি সত্তার উপর নির্ভরশীল হয় এবং এই নির্ভরশীলতা যদি পারস্পরিক হয় তবে ক্ষমতার আস্ফালনের জায়গাটাই তৈরী হয় না। ব্যক্তিসত্তার গঠনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তার উপরই নির্ভর করে যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয় কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে। এই ধারণা থেকেই জন্ম নেয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিভিন্ন রাজনীতি। ভাষা প্রয়োগ, প্রবাদ-প্রবচনে প্রতিফলিত হয় আমাদের যৌন ও লিঙ্গ ধারণা। তাই এরা মনে করেন, চিন্তার পরিমন্ডল ঢেলে সাজাতে না পারলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের লিঙ্গ-বৈষম্য থেকেই যাবে। যেহেতু, এরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব, তাই এঁদের মতে স্বাতন্ত্র্য বলতে বোঝায় সম্পর্কিত থেকেও নিজের ব্যক্তিগত স্বর প্রতিষ্ঠা করতে পারার ক্ষমতা।

র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিষ্টরা মনে করেন আইনের দ্বারা মেয়েদের কিছু সমস্যার সাময়িক সমাধান হয় বটে, কিন্তু মূল সমস্যাটি অপরিবর্তিত থাকে। তাই এঁরা সচেতনতা বৃদ্ধিকে আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে দেখেন। 'কনসাশনেস রেইজিং প্রোগ্রাম' (consciousness raising program) গড়ে তোলেন। কবিতা, গল্প, পথ-নাটক, সাহিত্য-সভা, আলোচনাবাসর ইত্যাদির মাধ্যমেও এঁরা জনমানসে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন।[৮]

গ্রন্থসূচী ঃ

১। বাংলার ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও সংগ্রাম—গঙ্গোপাধ্যায় আরতী, গণ উন্নয়ন পর্ষদ, কল, ১৯৯২

২। নৈতিকতা ও নারীবাদ, মৈত্র শেফালী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কল, ২০০৩, পৃঃ ১৫

৩। ঐ, পৃঃ ১৮-৩৪

৪। পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এঙ্গেল্‌স, এন. বি. এ, কল, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ৫৪

৫। ঐ, পৃঃ ৫৬

৬। নারীমুক্তির প্রসঙ্গে—কনক মুখোপাধ্যায়, এন. বি. এ. পৃঃ ৮৪

৭। মার্কসীয় বীক্ষায় নারীমুক্তি —আইচ রূপা (সম্পাদিত) ইমান সিপেশন পাবলিকেশন, কল, ২০০৬, পৃঃ ২৬-৬

৮। নৈতিকতা ও নারীবাদ, মৈত্র শেফালী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কল, ২০০৩, পৃঃ ৬৬-৮৬

৯। ঐ, পৃঃ ৯৮-১০৩